بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ১৭ অক্টোবর, ২০২৫ মোতাবেক ১৭ ইখা, ১৪০৪ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

পূর্ববর্তী খুতবায় যেমনটি তাবুক যুদ্ধের বিষয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছিল, আজ তার আরো বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই যুদ্ধ, অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মক্কা জয় করেন, তখন আবু আমের মাদানী, যে খাযরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের সাথে মেলামেশার কারণে যিকির-ওয়াযিফা করার অভ্যাস ছিল, যে কারণে লোকেরা তাকে 'রাহেব' (সন্ন্যাসী) বলত, কিন্তু ধর্মের দিক থেকে সে খ্রিষ্টান ছিল না; এই ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মদীনায় পৌঁছার পর মক্কার দিকে পালিয়ে যায়। যখন মক্কাও বিজিত হয় তখন সে ভাবতে থাকে, এখন ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য আমার অন্য কোনো কৌশল অবলম্বন করা উচিত। অবশেষে সে তার নাম ও ধরন বদলে মদীনার কাছে 'কুবা' নামক গ্রামে গিয়ে বসবাস শুরু করে। বছরের পর বছর বাইরে থাকার কারণে এবং চেহারা ও পোশাক কিছুটা পরিবর্তন করে নেবার ফলে মদীনার সাধারণ লোকজন তাকে চিনত না। কেবল সেই মুনাফিকরাই তাকে চিনত যাদের সাথে সে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। সে মদীনার মুনাফিকদের সাথে মিলে এই পরিকল্পনা করে যে, আমি সিরিয়ায় গিয়ে খ্রিষ্টান সরকার এবং আরব খ্রিষ্টান গোত্রগুলোকে উত্তেজিত করব এবং তাদেরকে মদীনায় আক্রমণ করার জন্য প্ররোচিত করব। এদিকে তোমরা এই গুজব ছড়ানো শুরু করে দাও যে, সিরীয় বাহিনী মদীনা আক্রমণ করতে যাচ্ছে। অর্থাৎ যারা মদীনার মুনাফিক, তারা যেন এই প্রচার শুরু করে দেয়। যদি আমার এই কৌশল সফল হয় তাহলে তো এই দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ হবেই, অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ হবে; আর যদি আমার কৌশল সফল না হয়, তাহলে এসব গুজবের কারণে মুসলমানরা হয়ত সিরিয়ায় গিয়ে নিজেরাই আক্রমণ করে বসবে এবং এভাবে রোমান সরকার ও তাদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যাবে আর আমাদের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। এই ফিতনা সৃষ্টিকারী বলে, উভয় পরিস্থিতিতেই আমাদের লাভ। সে অনুযায়ী এই উসকানি দিয়ে এ ব্যক্তি সিরিয়ার দিকে চলে যায় এবং মদীনার মুনাফিকরা প্রতিদিন মদীনায় এই খবর ছড়াতে আরম্ভ করে যে, অমুক কাফেলার সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল এবং তারা জানিয়েছে, সিরীয় সেনাবাহিনী মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পরের দিন আবার বলত, অমুক কাফেলার লোকেরা আমাদের সাথে দেখা করেছে এবং তারা বলেছে, সিরীয় সেনাবাহিনী মদীনা আক্রমণ করতে আসছে। এসব সংবাদ এত ব্যাপক হারে ছড়াতে থাকে যে, মহানবী (সা.) ইসলামী সেনাবাহিনী নিয়ে নিজেই সিরীয় বাহিনীর মোকাবেলা করতে যাওয়া সমীচীন মনে করেন। এই সময়টা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কষ্টের সময় ছিল। এটা ছিল দুর্ভিক্ষের বছর, বিগত মৌসুমে শস্য ও ফল কম উৎপন্ন হয়েছিল এবং এই মৌসুমের ফসল তখনও পরিপক্ক হয় নি, অর্থাৎ ফসল তখনও কাটা হয় নি। সেপ্টেম্বরের শেষ বা অক্টোবরের প্রথম দিকে তিনি (সা.) এই অভিযানের জন্য রওয়ানা হন। মুনাফিকরা আগেই জানত, এর পুরোটাই দুষ্টামি এবং তারা এই সমস্ত চালাকি এই

কারণে করেছে যে, যদি সিরীয় বাহিনী আক্রমণ না করে তবে মুসলমানরা নিজেরাই সিরীয়দের সাথে গিয়ে যুদ্ধ করবে এবং এভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। মুতার যুদ্ধের পরিস্থিতি তাদের সামনে ছিল, সেই সময় মুসলমানদেরকে এত বড়ো সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করতে হয়েছিল যে, তারা অনেক ক্ষতি স্বীকার করে কোনোমতে বেঁচে ফিরেছিল। এখন তারা নিজেদের চোখে আরেকটি মুতার দৃশ্য দেখতে চেয়েছিল, যেখানে তাদের ধারণামতে স্বয়ং মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে যাবেন, (নাঊযুবিল্লাহ্)। এ কারণে একদিকে মুনাফিকরা প্রতিদিন এই খবর ছড়াত যে, অমুক সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি– শত্রুরা আক্রমণ করতে আসছে, অমুক সূত্র থেকে জানতে পেরেছি– সিরীয় বাহিনী আসছে; আর অন্যদিকে তারা লোকজনকে ভয় দেখাচ্ছিল যে, এত বড়ো সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করা সহজ নয়। তোমাদের যুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। এসব কর্মকাণ্ড দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানরা সিরিয়া আক্রমণ করতে গেলেও যেন যতটা সম্ভব কম সংখ্যায় যায়, যেন তাদের পরাজয় আরো বেশি নিশ্চিত হয়। অর্থাৎ কম সংখ্যক হলে পরাজয় নিশ্চিত হবে।

যাহোক, আগত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) পরিস্থিতি ও ঘটনাগুলোর পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, যদি তিনি রোমানদের সাথে মোকাবিলা করতে বিলম্ব করেন বা তাদেরকে মুসলমানদের প্রভাবাধীন অঞ্চলে প্রবেশ করার সুযোগ দেন, তবে এর ক্ষতি বেশি হবে। এই কারণে তিনি কষ্ট ও কাঠিন্য সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নেন, রোমানদেরকে এগিয়ে আসার সুযোগ না দিয়ে স্বয়ং তাদের এলাকায় গিয়েই তাদের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ করা হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ অন্যত্র এই বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

মহানবী (সা.)-এর কাছে এসব গুজব পৌঁছলে তিনি এই নির্দেশ দেন যে, রোমানরা আমাদের ওপর চড়াও হয়ে আক্রমণ করার পরিবর্তে আমাদের উচিত সীমান্তে গিয়েই তাদেরকে প্রতিরোধ করা। তিনি মুসলমানদেরকে প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। [প্রথম একটি উদ্ধৃতি আমি একটি ইতিহাস গ্রন্থ থেকে দিয়েছিলাম। এই অংশটুকু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর।] যাহোক, মহানবী (সা.) সাধারণত যুদ্ধাভিযানগুলো কিছুটা গোপন রাখতেন। কিন্তু খায়বারের অভিযানের পর তাবুকের অভিযান এমন ছিল যে, তিনি (সা.) সাধারণ ঘোষণা করেন এবং পথের অসুবিধা ও শত্রুর আধিক্যের কথা আগে থেকে জানিয়ে প্রস্তুতি নেবার জন্য উৎসাহিত করেন। এই বর্ণনা বুখারীতে এসেছে। একই সাথে তিনি (সা.) মক্কা এবং অন্যান্য আরব গোত্রগুলোতে লোক পাঠান যেন তারা সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। অন্যদিকে তিনি (সা.) ধনী ব্যক্তিদেরকে জোর দিয়ে বলেন, তারা যেন আল্লাহ্‌র পথে তাদের সম্পদ খরচ করে। মহানবী (সা.) বিভিন্ন গোত্রকে যুদ্ধে অংশ নেবার বার্তা পাঠান এবং তাদের কাছে নিজের দূত প্রেরণ করেন, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত বুরাইদা বিন হুসাইবকে বনু আসলাম গোত্রের প্রতি, হযরত আবু রুহম গিফারীকে তার গোত্র বনু গিফারের প্রতি, হযরত আবু ওয়াকিদ লাইসীকে তার গোত্র বনু লাইসের প্রতি, হযরত আবু জা'দ যামরীকে তার গোত্রের প্রতি প্রেরণ করেন। হযরত রাফে বিন মাকীসকে জুহাইনার প্রতি পাঠান। একইভাবে হযরত নুয়াইম বিন মাসউদকে আশজাআ' এবং বুদাইল বিন ওয়ারাকা, আমর বিন সালিম ও বুসর বিন সুফিয়ানকে বনু কা'ব ও বনু আমর-এর প্রতি প্রেরণ করেন এবং একইভাবে আব্বাস বিন মিরদাসকে বনু সুলাইমের প্রতি রওয়ানা করেন।

মদীনায় সেই সময় এক কঠোর ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ ছিল এবং এর কারণ এটি ছিল যে, শক্তিশালী শত্রু যেকোনো সময় আক্রমণ করতে পারে। বস্তুত বুখারীর এক বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত উমর বর্ণনা করেন, আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতাম যে, একজন

গাসসানি রাজা আমাদের সাথে যুদ্ধের জন্য তার ঘোড়াগুলোর পায়ে নালও পরিয়ে ফেলেছে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছে। আর বুখারীরই একটি রেওয়ায়েতে হযরত উমরের বর্ণনা রয়েছে যে, আমরা এক গাসসানি রাজার ভয়ে ছিলাম। আমাদেরকে জানানো হয়েছিল, সে আমাদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই পরিবেশে আমাদের মন ভীত ছিল। যাহোক, তা সত্ত্বেও সাহাবীদের প্রস্তুতি এবং আর্থিক ত্যাগের যে ঈমানদীপ্ত প্রদর্শনী দেখা গিয়েছিল, তা-ও দেখার মতো ছিল। এর বিবরণে লেখা আছে, এই ভয় ও আতঙ্কের পাশাপাশি মদীনা সেই সময় কঠোর দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন ছিল এবং ফসল ও ফল পাকার অপেক্ষায় ছিল। এই দুর্ভিক্ষের মাঝে লোকেরা তাদের ফসল তোলার চিন্তা ও প্রস্তুতিতে থাকার সময় জিহাদের জন্য বের হবার ঘোষণা আসে। এছাড়া প্রবল গরম, শত শত মাইলের দীর্ঘ সফর এবং খাদ্য ও রসদের ঘাটতি– এসব তো ছিলই। এই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) জিহাদের আহ্বান জানালেন, তখন ঈমান ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ সাহাবীরা নিজেদের পাকা ফসল ও ফল রেখে জিহাদের প্রস্তুতিতে লেগে গেলেন। যদিও নিষ্ঠাবান কিন্তু দরিদ্র সাহাবীদের জন্য এমন দীর্ঘ যাত্রার প্রস্তুতি নেওয়া সহজ ছিল না এবং মহানবী (সা.) এসব কষ্ট-কাঠিন্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন, তাই তিনি (সা.) ধনীদেরকে আল্লাহ্র পথে দান করার এবং যানবাহন সরবরাহ করার নির্দেশ দিলেন। তিনি (সা.) বলেন, مَن جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি জাইশুল উসরা তথা তাবুককে সামগ্রীসহ প্রস্তুত করবে, সে জান্নাত লাভ করবে। এই আহ্বানের পর প্রথম যিনি ধনসম্পদ নিয়ে উপস্থিত হন তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)। তিনি (রা.) নিজের ঘরের সমস্ত সম্পদ নিয়ে আসেন যার পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য কিছু রেখে এসেছ, নাকি রাখো নি? তিনি (রা.) উত্তর দেন, পরিবার-পরিজনের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-কে রেখে এসেছি।

একটি রেওয়ায়েতে হযরত উমর (রা.) নিজের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, মহানবী (সা.) আমাদেরকে দান করতে বলেন। তখন আমার কাছে কিছু সম্পদ ছিল এবং আমি মনে মনে ভাবলাম, আমি কখনো যদি তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারি তবে তা আজই সম্ভব; আজ হয়ত আমি আবু বকরকে ছাড়িয়ে যেতে পারব। আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে এলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তোমার পরিবারের জন্য কী রেখেছ? আমি বললাম, যতটা এনেছি ঠিক ততটাই রেখে এসেছি। পক্ষান্তরে হযরত আবু বকর (রা.) তার কাছে যা ছিল সবকিছু নিয়ে আসেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু বকর! তুমি নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য কী রেখে এসেছ? হযরত উমর (রা.)-র সামনে জিজ্ঞাসা করেন বিধায় তিনি বলছেন। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, আমি তাদের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-কে রেখে এসেছি। তখন উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি বুঝলাম, কখনোই কোনো বিষয়ে আমি তাকে অতিক্রম করতে পারব না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ ঘটনাটি নিজের ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেন: একটি যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি ভাবলাম হযরত আবু বকর (রা.) সবসময় আমাকে অতিক্রম করেন, আজ আমি তাঁকে ছাড়িয়ে যাব। এটি ভেবে আমি বাড়িতে গেলাম এবং আমার ধনসম্পদ থেকে অর্ধেক সম্পদ নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত করলাম। সে সময়টি ছিল ইসলামের জন্য ভীষণ কষ্টের সময়, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) নিজের সমস্ত সম্পদ নিয়ে হাজির হন এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত করেন।

মহানবী (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, আবু বকর! বাড়িতে কী রেখে এসেছ? তিনি (রা.) নিবেদন করেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)। হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি শুনে আমি লজ্জিত হলাম এবং বুঝে গেলাম, আজকে আমি সমস্ত শক্তিসামর্থ্য লাগিয়ে আবু বকরকে পেছনে ফেলতে চাইলাম, কিন্তু আজও আবু বকর আমাকে অতিক্রম করে গেলেন।

হযরত উসমান (রা.)-র আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে একটি বর্ণনায় হযরত আবদুর রহমান বিন হাবাব (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, যখন তিনি উসরার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে (দানখয়রাতের) আহ্বান জানাচ্ছিলেন। তখন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) দাঁড়িয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি আল্লাহ্র পথে একশ উট, তাদের কাঁধের পালান ও রশিসহ দান করলাম। কিছুক্ষণ পর মহানবী (সা.) আবার সৈন্যবাহিনীকে আহ্বান জানালে হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) আবার দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি দু-শো উট, তাদের পালান ও কাঁধের সরঞ্জামসহ আল্লাহ্র রাস্তায় দান করছি। এসব কথা শোনার পরও মহানবী (সা.) পুনরায় সৈন্যবাহিনীর জন্য দান করতে আহ্বান জানান। তখন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) পুনরায় দাঁড়িয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি আল্লাহ্র রাস্তায় তিনশ উট, তাদের গদি ও হাওদাসহ প্রদান করার দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি মহানবী (সা.)-কে দেখি, তিনি (সা.) মিম্বর থেকে নীচে নেমে আসছিলেন এবং তিনি (সা.) বলছিলেন, مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ অর্থাৎ এর পরে সে যা কিছুই করবে তার জন্য উসমান ধৃত হবে না, এর পরে সে যা কিছুই করবে তার জন্য উসমান ধৃত হবে না!

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আব্দুর রহমান বিন সামারা বর্ণনা করেছেন, হযরত উসমান (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে এক হাজার দিনার উপস্থাপন করেন যখন তিনি জাইশুল উসরার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন; তিনি তা তাঁর (সা.) কোলে রাখেন। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে দেখলাম, তিনি (সা.) সেগুলোকে অর্থাৎ সেই দিনারগুলোকে তাঁর কোলে রেখে নাড়াচাড়া করছিলেন এবং বলছিলেন, مَا ضَرَّ عثمانَ ما عَمِلَ بعدَ اليومِ অর্থাৎ আজকের কৃতকর্মের পর উসমানের আর কোনো ক্ষতি হবে না। এ কথা দুইবার বলেছেন। এক বর্ণনানুযায়ী হযরত উসমান (রা.) সে সময় দশ হাজার দিনার প্রদান করেছিলেন আর তখন তিনি (সা.) হযরত উসমান (রা.)-র জন্য এই দোয়া করেছিলেন, غفر الله لک یا عثمان ما اسررت و ما اعلنت و ما هو قائم الی یوم القیامة ما یبالی ما عمل بعدها অর্থাৎ হে উসমান! আল্লাহ্ তা'লা তোমার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন, যা তুমি গোপনে করেছ এবং যা তুমি প্রকাশ্যে করেছ এবং যা কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। এরপর সে যা কিছুই করবে তার জন্য চিন্তিত হওয়া উচিত নয়।

আরেক বর্ণনানুযায়ী তিনি (রা.) এই যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য এক হাজার উট এবং সত্তরটি ঘোড়া প্রদান করেছিলেন। এক বর্ণনানুযায়ী মহানবী (সা.) সে সময় হযরত উসমান (রা.)-র জন্য এই দোয়া করেছিলেন, اللهم ارض عن عثمان فانی عنه راض অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট হও, কেননা আমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) তাবুকের যুদ্ধের সময় এত পরিমাণে অর্থ ব্যয় করেছেন যে, অন্য কোনো সাহাবী তা ব্যয় করতে সমর্থ হন নি। হযরত উসমান (রা.)-র একটি ব্যবসায়ী কাফেলা সিরিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ মুনাফা নিয়ে ফেরত আসে। তখন তিনি (রা.) সৈন্যবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশের ব্যয়ভার নিজের দায়িত্বে নিয়ে নেন। তিনি সৈন্যবাহিনীর

তিন ভাগের এক ভাগ সম্পর্কে বলেন, আমি এর ব্যয়ভার বহন করব। তিনি (রা.) দশ হাজারের অধিক সৈন্যবাহিনীর সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করেন এবং এই বিষয়টি নিশ্চিত করেন যে, প্রত্যেক সৈন্যের জন্য যেন একটি করে জুতার ফিতাও তাঁর অর্থ থেকে ক্রয় করা হয়, অর্থাৎ তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ সামগ্রীও। এতে তাঁর দশ হাজার দিনার ব্যয় হয় যা উট ও ঘোড়া ব্যতীত ছিল। এছাড়া এক হাজার উট, একশ ঘোড়া এবং অন্যান্য সামগ্রীর পাশাপাশি এক হাজার দিনারও মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থাপন করেন। এই এক হাজার দিনার সেই দশ হাজার দিনার থেকে পৃথক ছিল যা তিনি দশ হাজার সৈন্যবাহিনীর প্রস্তুতির জন্য ব্যয় করেছিলেন। সে সময় হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) একশ উকিয়া রুপা প্রদান করেন। কতক বর্ণনানুযায়ী দু-শো উকিয়া রুপা প্রদান করেন। এই উকিয়াও একটি পরিমাণ যা সাড়ে দশ তোলার সমপরিমাণ। অর্থাৎ এক হাজার পঞ্চাশ বা দুই হাজার একশ তোলা পর্যন্ত রুপা অথবা সোয়া কিলোগ্রাম বা আড়াই কিলোগ্রাম রুপা; যদি বর্তমান যুগের তুলনায় বিবেচনা করা হয়।

এরপর মহানবী (সা.) বলেন, উসমান বিন আফফান এবং আব্দুর রহমান বিন অওফ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডারসমূহের মধ্য হতে ধনভাণ্ডার, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে ব্যয় করে। তাঁরা অনেক সম্পদ প্রদান করেছেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) চারশ উকিয়া স্বর্ণ প্রদান করেছিলেন, অর্থাৎ চার হাজার দু-শো তোলা স্বর্ণ। অনেকে নয়শ উট উপস্থাপন করার কথাও উল্লেখ করেছেন। যাহোক, অনেক কুরবানীর কথা বর্ণিত আছে।

একটি বর্ণনা অনুসারে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ তাঁর (সা.) কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আমার কাছে আট হাজার দিরহাম রয়েছে; চার হাজার দিরহাম আমি পরিবারের জন্য রেখে এসেছি আর চার হাজার দিরহাম আপনার সমীপে উপস্থাপন করছি। তিনি (সা.) তার জন্য কল্যাণের দোয়া করে বলেন, **بارك الله فيما أمسكتَ وفيما أعطيتَ** অর্থাৎ যে ধনসম্পদ তুমি পরিবারবর্গের জন্য রেখেছ আর যা আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করেছ– আল্লাহ্ তা'লা সবকিছু বরকতময় করুন।

হযরত আসিম বিন আদী (রা.) সত্তর 'ওয়াসাক' (সে যুগের পরিমাপের একক) খেজুর উপস্থাপন করেন। এক ওয়াসাক ষাট সা' পরিমাণ। আর এক সা' প্রায় তিন সের। অর্থাৎ সর্বমোট প্রায় বারো হাজার ছয়শ কেজি খেজুর। মহানবী (সা.)-এর কাছে সম্পদ উপস্থাপনকারী বা কুরবানীকারীদের মাঝে হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব, হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্, হযরত সা'দ বিন উবাদা এবং হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার নামও পাওয়া যায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সেই যুগ ছিল যখন ঐশী ধর্মের জন্য মানুষ নিজেদের প্রাণ কুরবানীর প্রাণীর মতো উৎসর্গ করে দিত, ধনসম্পদ কুরবানীর কথা তো বলাই বাহুল্য! হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) একাধিকবার নিজের সমস্ত ধনসম্পদ উৎসর্গ করেছেন, এমনকি একটি সুঁই পর্যন্ত নিজের ঘরে রাখেন নি। আর অনুরূপভাবে হযরত উমর (রা.)-ও নিজের সঙ্গতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এবং হযরত উসমান (রা.) নিজেদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী (কুরবানী করেন)। এভাবে এবং নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সকল সাহাবী নিজেদের প্রাণ এবং সম্পদ এই ঐশী ধর্মের খাতিরে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (সূরা আলে ইমরান: ৯৩) অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের প্রিয়তম জিনিসকে আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় ব্যয় না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। আর পুণ্য অর্জনের জন্য সাহাবীরা ব্যয় করতেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, অনেক সময় সাহাবীরা নিজেদের ঘরের সম্পদ এবং আসবাবপত্র বিক্রি করে যুদ্ধের খরচাদি জোগাড় করেছেন। বরং এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় যে, অনেক সময় তারা নিজেদের সম্পত্তি বিক্রি করে অন্যান্যদের জন্য ব্যয় করেছেন আর যুদ্ধে গমনকারী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করেছেন। যাহোক, একবার মহানবী (সা.) বাইরে আসেন এবং বলেন, অমুক সফরে আমাদের সৈন্যবাহিনী যাচ্ছে, কিন্তু মু'মিন সৈন্যবাহিনীর কাছে কোনোকিছুই নেই। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে পুণ্য অর্জন করতে চায়? হযরত উসমান (রা.) এটি শুনতেই উঠে দাঁড়ান এবং নিজের সঞ্চিত অর্থ বের করে মুসলমানদের বিভিন্ন ব্যয়ভারের জন্য মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.) এটি দেখে বলেন, উসমান জান্নাত ক্রয় করে নিয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রা.)-ও আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে নিজের একটি খুতবায় এই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন: একবার এক যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য অনেক বেশি অর্থের প্রয়োজন ছিল আর সে সময় কিছুটা আর্থিক সংকটও ছিল। পৃথিবীর রীতিই এমন; অর্থাৎ কখনো সচ্ছলতার দিন থাকে আবার কখনো অসচ্ছলতার দিন। তখনো আর্থিক সংকটের দিন ছিল আর যুদ্ধসামগ্রীরও প্রয়োজন ছিল। মহানবী (সা.) সকল সাহাবীর সামনে যথার্থ চাহিদা উপস্থাপন করেন এবং আর্থিক কুরবানী উপস্থাপন করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানান, যার ফলাফল এমন দাঁড়ায় যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ নিয়ে আসেন, হযরত উমর (রা.) তাঁর অর্ধেক সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হন। হযরত উসমান (রা.) নিবেদন করেন, [হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)!] আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করুন, আমি দশ হাজার সাহাবীর যাবতীয় খরচ বহন করতে চাই। এর পাশাপাশি তিনি (রা.) আরো এক হাজার উট ও সত্তরটি ঘোড়া দান করেন। এভাবে সকল নিষ্ঠাবান সাহাবী তাদের শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক কুরবানী উপস্থাপন করেন। আর আল্লাহ্ তা'লা এভাবে তাদের এই কুরবানীর সর্বোত্তম ফলাফল সৃষ্টি করেন।

এটি আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ যে, আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করে। আমি প্রায় সময়ই ঘটনাবলি উল্লেখ করে থাকি; এমন অনেকেই আছেন, যারা নিজেদের যা কিছু আছে– সবই আল্লাহ্র রাস্তায় উৎসর্গ করে দেন। ধনীদের, বিত্তবানদের হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-র দৃষ্টান্ত সামনে রেখে নিজেদের কুরবানীর মান বৃদ্ধি করা উচিত। গরীব ও মধ্যবিত্তরা তো অন্যান্য কুরবানী করছে, তবে আল্লাহ্র অনুগ্রহে অনেক ধনীও উন্নত পর্যায়ের কুরবানী করে যাচ্ছেন। যারা দুর্বল তাদেরও ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য এগিয়ে আসা উচিত। এই যুগে তাদেরও কুরবানী করার সুযোগ আছে।

সাহাবীরা তাদের সাধ্যানুযায়ী কিছু না কিছু উপস্থাপন করেছেন। আর তারা দরিদ্র ও অসহায় সৈনিকদের জন্য যানবাহন, তরবারি ও অন্যান্য যুদ্ধসরঞ্জামের যোগান দিয়েছেন। অনেক দরিদ্র সাহাবী বা সাহাবীয়া যখন এক-দুই মুদ শস্য দান করতেন, তখন তারা এই

আকাঙ্ক্ষায় আবেগাপ্লুত হয়ে যেতেন যে, হায়! যদি আমাদের কাছে আরো থাকত তাহলে তা-ও দিয়ে দিতাম। কিন্তু মুনাফিকরা এই বলে উপহাস করত যে, এই মুষ্টিমেয় শস্যদানা দিয়ে নাকি এরা রোমান সম্রাট কায়সারকে পরাজিত করবে! মুদ মুষ্টির সমান ছোটো একটি পরিমাপ। আল্লাহ্ তা'লা এই মুনাফিকদের উপহাসের জবাবে বলেন,

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (সূরা তাওবা: ৭৯)

অর্থাৎ মু'মিনদের মাঝ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তে পুণ্য সম্পাদনকারীদের দানখয়রাত সম্পর্কে যারা অপবাদ দেয় এবং তাদের সম্পর্কেও– যারা নিজেদের শ্রম ছাড়া আর কিছুই দেবার মতো পায় না, আর তারা তাদের সাথে ঠাট্টাবিদ্রুপ করে; আল্লাহ্ তাদের ঠাট্টাবিদ্রুপের শাস্তি দেবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

কায়িকশ্রমের বিনিময়ে দানকারীদের মধ্যে হযরত আবু আকীল (রা.)-ও ছিলেন। তিনি সারারাত কূপ থেকে পানি তুলেছিলেন, আর এর বিনিময়ে পেয়েছিলেন দুই 'সা' খেজুর। এক 'সা' প্রায় আড়াই কিলোগ্রামের সমান, অর্থাৎ মোট পাঁচ কিলোগ্রাম খেজুর উপার্জন করেছিলেন। তা থেকে এক 'সা' তিনি পরিবারের জন্য রেখে বাকি এক 'সা' নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। এটিই ছিল তার সাকুল্য কুরবানী।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, একদা মহানবী (সা.) চাঁদা প্রদানের আহ্বান জানান। এক সাহাবী তখন কিছু কায়িকশ্রম করেন; সম্ভবত কারো কূপ থেকে পানি তুলেছিলেন। এর বিনিময়ে তিনি (রা.) হয়ত আধ সের বা তিন পোয়া পরিমাণ শস্য উপার্জন করেছিলেন; তা তিনি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। তখন হাজার হাজার রুপির প্রয়োজন ছিল, আর মুনাফিকরা উপহাস করে বলত, এটা নাকি যুদ্ধের প্রস্তুতি হচ্ছে! এটি তাবুকের যুদ্ধের ঘটনা, যা রোমানদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল। আর রোমান সাম্রাজ্য সে যুগে ততটাই ক্ষমতাশালী ছিল, যতটা এ যুগে ব্রিটিশ সরকার। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন একথা বলেন, সে সময় পৃথিবীতে ইংরেজদের রাজত্ব ছিল।] আর এত বিশাল রাজত্বের বিপক্ষে যুদ্ধের জন্য সেই সাহাবী সামান্য কয়েক মুষ্টি যব নিয়ে আসেন। মুনাফিকরা এটি নিয়ে উপহাস করছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন এই বিষয়ে জানতে পারেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তারা জানে না– আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এই যবের মূল্য কী! এ সেই যব যার কল্যাণে মুসলমানরা বিজয় লাভ করেছে আর রোমানরা পরাজিত হয়েছে; আর কেবল রোমানরাই নয়, বরং পারস্য সাম্রাজ্যও– যারা রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিপক্ষ ছিল– তাদেরকেও মুসলমানরা পরাজিত করেছে।

একজন সাহাবীর অদ্ভুত একটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, এই যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য নিষ্ঠাবান সাহাবীরা কোনো না কোনোভাবে সফরের প্রস্তুতি এবং আর্থিক কুরবানীর সেই আহ্বানে অংশ নেবার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করছিলেন। সম্পদশালী সাহাবীরা নিজেদের ধনসম্পদ উপস্থাপন করছিলেন। গরীব ও নিঃস্ব সাহাবীরা পরিশ্রম করে সামান্য যা-ই পারিশ্রমিক পেতেন তা-ই উপস্থাপন করছিলেন। এমতাবস্থায় উরওয়া বিন যায়েদ (রা.) নামে এক সাহাবীর উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তিনি (রা.) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এমন একটি নিষ্পাপ পদ্ধতি অবলম্বন করেন যা অন্য সকলের থেকে ভিন্ন ও অনন্য ছিল। তিনিও রিক্তহস্ত কিন্তু নিষ্ঠাবান ছিলেন আর দান করার জন্য তার কিছুই ছিল না, আর তার জিহাদে অংশগ্রহণ করারও শক্তি ছিল না। অতএব, তিনি এক রাতে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হন

আর বিগলিত চিত্তে দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তুমি জিহাদ করার আদেশ দিয়েছ আর এ বিষয়ে উদ্‌বুদ্ধ করেছ। কিন্তু আমার কাছে কিছুই নেই আর তোমার রসূল (সা.)-এর কাছে এতটা যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম নেই, যা তিনি আমাকে দিতে পারেন আর আমি তা দ্বারা যুদ্ধ করতে পারি। আর তোমার নবী আর্থিক কুরবানীর আহ্বান করেছেন আর আমি তাতে অংশও নিতে পারছি না। তবে আমি নিজের প্রাণ, সম্পদ ও সম্মানের ওপর হওয়া সকল অন্যায় ক্ষমা করে সেই সব মুসলমানদের জন্য সদকা করে থাকি। যখন সকাল হলো তখন তিনি অন্যান্য সাহাবীদের সাথে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, আজ রাতে নিজের সম্মানের সদকাকারী কোথায়? কেউ না দাঁড়ানোয় তিনি (সা.) আবার বলেন, কিন্তু এবারও কেউ দাঁড়াল না। পরিশেষে হযরত উরওয়া (রা.) দাঁড়ান আর তাঁকে (সা.) সকল কথা বলেন। তিনি (সা.) বলেন,

أَبْشِرْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ كُتِبْتَ فِي الزَّكٰوتِ الْمُتَقَبَّلَةِ

অর্থাৎ, আনন্দিত হও! আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ। তোমাকে সেসব মানুষের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাদের সদকা কবুল করা হয়েছে। কত অদ্ভুত সুন্দর নিষ্ঠা ও কুরবানীর চেতনা! আর আল্লাহ্ তা'লা যিনি হৃদয়ের অবস্থা জানেন আর যিনি সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তিনিও তার এই চেতনা কবুল করেছেন আর এর সংবাদও মহানবী (সা.)-কে দিয়েছেন।

সে সময় নারীরাও পিছিয়ে থাকেন নি। তারাও এই যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য নিজেদের অলংকারাদি উপস্থাপন করেছিলেন। যেভাবে হযরত উম্মে সিনান আসলামিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আয়েশার (রা.) ঘরে মহানবী (সা.)-এর সামনে একটি কাপড় বিছানো দেখি যাতে সুগন্ধি, বাহুবন্ধনী, কঙ্কন বালা, আংটি ও কানের দুল এবং নুপূরও ছিল যেগুলো নারীরা মুসলমানদের জিহাদের প্রস্তুতির জন্য দিয়েছিল। যাহোক, একদিকে নিষ্ঠাবান মু'মিনদের অবস্থা এমন ছিল, আর অন্যদিকে এ সময়ে মুনাফিকরা নিজেদের সকল চেষ্টাপ্রচেষ্টা কাজে লাগিয়েছিল। একদিকে এটি মুনাফিকদের পক্ষ থেকে শেষ ষড়যন্ত্র ছিল আর মুনাফিকরা নিজেদের সাফল্যের বিষয়ে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী ছিল। তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখত, মুসলমানরা অবশ্যই সিরিয়া অভিমুখে এই লম্বা সফরে বের হবে। আর তারা এই শয়তানি বিশ্বাসেও প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, (নাঊযুবিল্লাহ্) মহানবী (সা.) হয়ত মদীনা ফিরে আসতে পারবেন না। এজন্য তাদের চেষ্টা ছিল যেন কম সংখ্যক মুসলমান তাঁর (সা.) সাথে যায়, আর তাদের ধারণানুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা যত কম হবে, সৈন্যবাহিনীও ততই ছোটো হবে আর এই সেনাবাহিনীর পরাজয় ও মৃত্যু নিশ্চিত হবে। এ কারণে তারা বিরাজমান পরিস্থিতির সংকট, সফরের কষ্ট এবং সমস্যা অতিরঞ্জিত রূপে উপস্থাপন করা আরম্ভ করে। তারা মুসলমানদেরকে ভয় দেখাতে শুরু করে। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তারা তাদেরকে যোগ না দেবার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে, যেমন গরম তীব্র, পথ দীর্ঘ এবং যাতায়াতের মাধ্যম সীমিত। যেহেতু মদীনার অধিকাংশ জনগোষ্ঠী কৃষিজীবি ছিল, তাদের ফসল কাটার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং দুর্ভিক্ষের সময় এই ফসল প্রস্তুত হচ্ছিল। তারা মদীনার বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের সাথে এ কথা বলত যে, তোমরা জানো না– এখন তোমাদের যে সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হতে হবে, তারা কতটা শক্তিশালী এবং যুদ্ধবাজ। তাদের সাথে যুদ্ধ করা সহজ কাজ নয়। তোমাদের দেখে আমাদের ধারণা হয়, তোমরা সবাই হয়ত মারা পড়বে নতুবা তোমরা সবাই তাদের হাতে বন্দি হয়ে যাবে। এগুলো ছিল মুনাফিকদের কথা। যদিও

মুনাফিকদের এসব অপপ্রচারে উঁচুমাপের ও খাঁটি মু'মিনদের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে নি। তথাপি কিছু দুর্বল ঈমানের লোকের হৃদয় এতটাই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, তারা যুদ্ধে না যাবার জন্য বিভিন্ন অজুহাত খুঁজতে থাকে। যদিও যারা এই ধরনের অজুহাত তৈরি করেছিল তাদের বেশিরভাগই ছিল মুনাফিক। পবিত্র কুরআনে মুনাফিকদের এসব অপপ্রচার এবং অজুহাত দিয়ে পেছনে থাকার কথা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ
قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (সূরা তাওবা: ৮১-৮২)

অর্থাৎ যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল, তারা আল্লাহ্‌র রসূলের বিরোধিতা করে ঘরে বসে থাকতে পেরে খুবই আনন্দিত হয়েছিল। তারা তাদের ধনসম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে অপছন্দ করেছিল। তারা একে অপরকে বলেছিল, এই প্রচণ্ড গরমে (যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয়ে) বাইরে যেও না। তুমি তাদেরকে বলো, জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে বেশি উত্তপ্ত। হায়, যদি তারা বুঝত! অতএব তাদের উচিত, তারা যেন তাদের এই ধোঁকাবাজির কারণে কম হাসে আর নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফলের কারণে অধিক কাঁদে।

বিভিন্ন বর্ণনানুযায়ী, এই লোকগুলো মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিহাদে না যাবার জন্য নানা অজুহাত পেশ করত এবং অনুমতি চাইত, আমরা যেন যুদ্ধে না যাই। মহানবী (সা.) তাদের অনুমতি দিয়ে দিতেন। এমন ব্যক্তি আশিজনেরও বেশি ছিল, যারা নানা রকম অজুহাত ও ছলনার মাধ্যমে যুদ্ধে না যাবার অনুমতি নিয়েছিল। এরা ছিল সেসব মুনাফিকের বাইরে, যারা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই প্রমুখের সঙ্গে ছিল।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এ সমস্ত মুনাফিকের অজুহাতের পর্দা উন্মোচন করে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, তাদের পেছনে থেকে যাওয়া তাদের ঈমানের দুর্বলতার কারণেই হয়েছে আর তারা মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করিয়েছে।

কুরআনে তাদের সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ করে ভবিষ্যতে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হলো, যখনই ইমামের পক্ষ থেকে কোনো আহ্বান আসে, তখন তাৎক্ষণিকভাবে কীভাবে 'লাব্বায়েক' বলা উচিত; তখন দ্বিধা না করে অগ্রসর হওয়া উচিত এবং যতদূর সম্ভব সেই কাজে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ
أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (সূরা আত-তাওবা: ৪২-৪৮)

"যদি দূরত্ব কম হতো আর যাত্রা সহজ হতো, তাহলে তারা নিশ্চয় তোমার অনুসরণ করত। কিন্তু সেই কঠিন সফর তাদের কাছে সুদীর্ঘ মনে হলো। তারা অবশ্যই আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলবে, 'যদি আমাদের সামর্থ্য থাকত, আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে যেতাম।' তারা

নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে। আর আল্লাহ্ জানেন, তারা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তোমাকে মার্জনা করুন। কারা সত্য বলেছে তা তোমার নিকট ভালোভাবে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং মিথ্যাবাদীদের না চেনা পর্যন্ত তুমি কেনইবা তাদের অনুমতি দিলে? যারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে তারা তোমার কাছে নিজ ধনসম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করা থেকে অব্যাহতি চায় না। আর আল্লাহ্ মুত্তাকীদের বিষয়ে সম্যক অবগত। তোমার কাছে কেবল তারাই অব্যাহতি চায় যারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে না। আর তাদের হৃদয় সন্দেহগ্রস্ত এবং তারা সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর তারা যদি (জিহাদে) বের হবার সংকল্প রাখত তাহলে তারা এর জন্য নিশ্চয় প্রস্তুতিও নিত, কিন্তু (এ মহৎ উদ্দেশ্যে) তাদের অভিযাত্রাকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন নি। তাই তিনি তাদেরকে (সেখানেই) বসে থাকতে দিলেন এবং (তাদের) বলা হলো, '(ঘরে) বসে থাকা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাকো।' তারা যদি তোমাদের সাথে (জিহাদে) বেরও হতো তাহলে তোমাদের মাঝে কেবল বিশৃঙ্খলাই বৃদ্ধি করত এবং তোমাদের মাঝে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ঘোড়া হাঁকিয়ে বেড়াতো। অথচ তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার লোকও তোমাদের মাঝে রয়েছে। আর আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালো করেই জানেন। নিশ্চয় তারা আগেও নৈরাজ্য (সৃষ্টি করতে) চেয়েছিল এবং বিষয়াদি ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে তোমার কাছে উপস্থাপন করেছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য এসে গেল এবং আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত প্রকাশ পেয়ে গেল, অথচ তারা (তা) বড়োই অপছন্দ করত।"

সুতরাং মুনাফিকদের অবস্থা আল্লাহ্ তা'লা এতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। মহানবী (সা.)-কে বলেন, তুমি তাদের মিথ্যা অজুহাত গ্রহণ করেছ। যদি গ্রহণ না করতে এবং অনুমতি না দিতে তাহলে তাদের কপটতা জনসম্মুখে উন্মোচিত হয়ে যেত, প্রকাশ পেয়ে যেত। যুদ্ধে তারা কোনোক্রমেই যেত না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, তাদের না যাওয়াটাই উত্তম। কেননা যদি কোনো কারণে তারা যুদ্ধে যোগ দিত তাহলে যুদ্ধের মাঝে এমন সব কর্মকাণ্ড করত যার ফলে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্থ হতো। এসব মুনাফিকদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলাফল প্রকাশিত হয় নি। এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাল্লাহ্ ভবিষ্যতে বণনা করব।

গত খুতবায় আমি রাবওয়ার মসজিদে আক্রমণের উল্লেখ করেছিলাম। যেসব আহমদী খোদ্দাম আহত হয়েছেন তাদের জন্য দোয়াও করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে পূর্ণ আরোগ্য দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সব ধরনের জটিলতা থেকে রক্ষা করুন। কখনো কখনো পরবর্তীতেও কুফল প্রকাশিত হয়; এ ধরনের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে এসব ঘটে থাকে। এ মুহূর্তে তিনজন খোদ্দাম গুরুতর আহত আর এই কারণে বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। অবশিষ্ট পাঁচজনকে চিকিৎসার পর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের (পূর্ণ) চিকিৎসা হতে ও বিভিন্ন আঘাত পুরোপুরি সারতে সময় লাগবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে দ্রুত ও পরিপূর্ণ আরোগ্য দান করুন; ভবিষ্যতেও প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে, প্রত্যেক ক্ষতি থেকে, প্রতিটি স্থানে জামা'তের সদস্যদের রক্ষা করুন।

নামাযের পর একজনের গায়েবানা জানাযা পড়াবো, মুকাররম স্যাম আলী নেনা সাহেবের যিনি মার্শাল আইল্যান্ডের অধিবাসী ছিলেন; সম্প্রতি তিরাশি বছর বয়সে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি সর্বপ্রথম আমাদের মুরব্বী সিলসিলাহ হাফেয জিব্রাঈল সাঈদ সাহেবের তবলীগের মাধ্যমে মাধ্যমে আশির দশকে ইসলাম ধর্মের সাথে পরিচিত হন। সে সময়ে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন। প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন, তা

সত্ত্বেও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে নিজ বিশ্বাসে অটল ছিলেন। একজন সিনেটর পার্লামেন্টে এই ঘোষণা দেন যে, ইসলাম একটি অবৈধ এবং সন্ত্রাসী ধর্ম। তখন তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে স্থানীয় এক সংবাদপত্রে এই বার্তা দেন যে, আমরা আহমদী মুসলমান এবং সন্ত্রাসবাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তার এই সাহসী বক্তব্য জামা'তের জন্য দৃঢ়তার কারণ হয়। সেই সিনেটর আইনটি পাশ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তার প্রচেষ্টায় তা ব্যর্থ হয়। নিজ এলাকায় তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

আমেরিকার নায়েব আমীর জনাব ফালাহ্ উদ্দীন শামস সাহেব লেখেন, আমার পাঁচ বছর মার্শাল আইল্যান্ডে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। যেহেতু দ্বীপটি আমেরিকার অধীনে ছিল তাই আমি সেখানে যেতাম। হাফেয জিব্রাঈল সাহেবের মাধ্যমে স্যাম সাহেব আহমদী হয়েছিলেন। শুরুতে চার-পাঁচটি পরিবার আহমদী ছিল এবং ছোটো জামা'ত ছিল। জামা'ত তখনও নিবন্ধিত হয় নি। কিন্তু হাফেয সাহেব ও তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জামা'ত সেখানে নিবন্ধিত হয়। হাফেয সাহেব সেখান থেকে চলে আসার পর একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে কোনো মুরব্বী ছিল না। এরপর স্যাম সাহেব নিজেই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জামা'তের দেখাশুনা করেছেন, তবলীগের কাজ করেছেন এবং কোনো অবস্থাতেই জামা'তের নাম ম্লান হতে দেন নি। গভীর আন্তরিকতার সাথে জামা'তের সেবা করতেন। যখনই এখান থেকে কোনো কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল সেখানে যেত, তিনি তাদের সহযোগিতা করতেন। সর্বদা আগ বাড়িয়ে কাজ করতেন এবং ফলপ্রসূ কাজ করতেন।

মার্শাল আইল্যান্ডে জামা'ত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি প্রথম সারিতে রয়েছেন। অধিকাংশ নও মোবাঈন তার প্রচেষ্টার ফলেই আহমদী মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি মার্শাল আইল্যান্ড জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছেন। শামস সাহেব আরো বলেন, যখন তিনি কোসরায়-তে মিশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যান, সেখানেও স্যাম সাহেব তাকে সাহায্য করেন। তার কিছু বন্ধুও এতে যোগ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র অশেষ অনুগ্রহে সেখানে মিশন হাউজ ক্রয় করা হয় এবং ভবন নির্মাণ করা হয়। অনুরূপভাবে কিরিবাতিতেও তার মাধ্যমে মিশন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা লাভ হয়। একইভাবে অপর একটি স্থানেও তার সহযোগিতায় মিশন প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি বলেন, আমি একবার স্যাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার মাঝে এমন কোন পুণ্য রয়েছে যার ফলে আপনি তিনটি দ্বীপে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করা ও কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন? তখন তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন, এগুলো সব আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ! আমার তো কোনো যোগ্যতা নেই। মার্শাল আইল্যান্ডের মুরব্বী সিলসিলাহ্ কাসেম চৌধুরী সাহেব বলেন, নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি নিজ ঈমানে অটল ছিলেন। নিজ সহধর্মিণীকে সাথে নিয়ে কুরবানী করেছেন এবং তার সহধর্মিণীর কুরবানীর ফলে একটি জমি ওয়াকফ হয়েছে। তার স্ত্রী নিজের এক খণ্ড জমি ওয়াকফ করেছিলেন, যার ওপর আজ মার্শাল আইল্যান্ডের প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা তিনি নিজে এভাবে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, ১৯৮৭ সালে আমি এবং আমার স্ত্রী মেরি, লং আইল্যান্ডের একটি হোটেলে অবস্থান করছিলাম। একদিন সকালে আমরা রুম থেকে বাহিরে বের হয়ে একজন দীর্ঘ আফ্রিকান ব্যক্তিকে দেখতে পাই। আমি সালাম দিলে তিনিও সালামের উত্তর দেন। পরিচয়ের পরে জানতে পারি, তিনি মাইক্রোনেশিয়ার প্রথম মোবাল্লেগ হাফেয জিব্রাঈল সাঈদ সাহেব। যাহোক, পরবর্তীতেও তার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হতে থাকে এবং একটি ভালো সম্পর্কও গড়ে ওঠে। জিব্রাঈল

সাহেব আমাকে তবলীগ করেন এবং বাইবেলের বিভিন্ন শ্লোক আমাকে দেখান এবং এ-ও বলেন যে, বাইবেলে হযরত ঈসা (আ.)-এর পর একজন নবীর আগমনের সুসংবাদ রয়েছে। আমি আশ্চর্য হলাম যে, কেবল একটি শ্লোক নয় বরং অনেকগুলো শ্লোক রয়েছে। এমনকি নতুন নিয়মে হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং বলেন, 'আমাকে যেতে হবে আর তিনি আমার পর অন্য কাউকে প্রেরণ করবেন।' **(যোহন, অধ্যায় ১৬, শ্লোক ৭)**

তিনি বলেন, এগুলো এমন সত্য ছিল যা আমি পূর্বে কখনো শুনি নি, এবং হাফেয সাহেব আমাকে প্রত্যেকটি বিষয় বাইবেল থেকে খুবই স্পষ্ট করে বলতেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে হিদায়াত দেন এবং আমি সত্য বিষয় বুঝতে পারি। আমার হৃদয় ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং আমি ইসলাম গ্রহণ করি। তিনি বলেন, সেই সময় যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করি এবং লোকেরা জানতে পারে তখন সরকারি কর্মকর্তারা বলে, আমরা ইসলামকে কখনো মার্শাল আইল্যান্ডে বিস্তার লাভ করতে দেবো না। তিনি বলেন, এরপর আমি হাফেয সাহেবকে ফোন করি, তিনি তখন সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আপনি চিন্তা করবেন না; আল্লাহ্ তা'লা পথ খুলে দেবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা এমন পথ খুলে দেন যে, একদিন আমি ঘরে বসে ছিলাম, এমন সময় এটর্নি জেনারেলের অফিস থেকে এক ব্যক্তি আসে এবং আমাকে বলে, আপনার জামা'ত প্রতিষ্ঠার জন্য রেজিস্ট্রেশন অনুমোদন হয়ে গেছে। কোথায় বড়ো বড়ো ব্যক্তিরা বাধা দিতে চাচ্ছিল, সেখানে আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবস্থা করেন যে, তিনি স্বয়ং রেজিস্ট্রেশন অনুমোদনের ব্যবস্থা করে দেন এবং তা ঘরে পৌঁছে যায়। তিনি বলেন, আমি তৎক্ষণাৎ সেই কপিটি হাফেয সাহেবকে পাঠিয়ে দিই। এরপর তিনি বলেন, যাহোক, সময় পার হবার সাথে সাথে আমি বুঝতে পারি আহমদীয়াত অন্যান্য মুসলমানদের থেকে স্বতন্ত্র এবং আমি এ কারণে গর্ব বোধ করি। সর্বদা আমার হৃদয়ে একটি আওয়াজ উঠত যে, আমি আহমদী মুসলমান এবং এজন্য আমি গর্বিত। তিনি বলেন, এখানে বিশ বছর যাবৎ কোনো মুবাল্লেগ আসেন নি এবং আমি এজন্য খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। হাফেয সাহেব বলেন, আপনি যুগ-খলীফাকে চিঠি লিখতে থাকুন, কোনো না কোনো ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তিনি বলেন, যাহোক, ২০০৪ সালে কেন্দ্র থেকে আমার কাছে নির্দেশনা আসে যে, একজন বিদেশি ব্যক্তি আসবেন, আপনি তাকে বিমানমন্দর থেকে নিয়ে আসবেন। তিনি বলেন, আমি বিমানবন্দরে যাই; কিছু সময় পর একজন ব্যক্তি হাসিমুখে বেরিয়ে আসেন এবং আমার নাম জিজ্ঞেস করেন। আমি বলি, স্যাম। তিনি উত্তরে বলেন, আমার নাম কাওসার। তিনি এনামুল হক কাওসার সাহেব ছিলেন (বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল আমীর- অনুবাদক)। তিনি বলেন, সেদিন থেকে আমরা দুইজন ভাইয়ের মতো হয়ে যাই। আমরা একত্রে কোসরায়ে এবং পনপেই সফর করি। এক সপ্তাহ সেখানে অবস্থান করি। এরপর আমরা যখন আলাদা হই তখন আমাদের সম্পর্ক এমন ছিল যে, আমরা যেন একে অপরকে দীর্ঘ সময় থেকে চিনি। এটি ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ছিল। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মুসলমান হবার পর আমার হৃদয় প্রশান্তি এবং আত্মা স্থিতি লাভ করে। নামায আমাকে পরিবর্তন করে দেয়। আমার স্ত্রীও আমার মাঝে পরিবর্তন বুঝতে পারে। এরপর থেকে যখনই আমার কোনো কিছুর প্রয়োজন হতো আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে চাইতাম এবং আল্লাহ্ তা'লা তৎক্ষণাৎ তা পূরণ করে দিতেন। অসংখ্যবার আমি এই সাহায্য নিজ চোখে দেখেছি এবং প্রত্যেক দোয়াতে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি।

তার দৌহিত্রী জুলিয়া বলেন, তিনি খুবই নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন যিনি তার ঈমানের মাধ্যমে সান্ত্বনা ও শক্তি লাভ করতেন। অধিকাংশ সময় ইবাদতে পার করতেন এবং পবিত্র

কুরআন তিলাওয়াতকে খুবই পছন্দ করতেন। বিভিন্ন ইসলামী পুস্তক পাঠ করতে থাকতেন। অধিকাংশ সময় আমি তাকে গভীর চিন্তাভাবনায় মগ্ন থাকতে দেখতাম। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন; তার পরিবারের কয়েকজন ব্যক্তি আহমদী নন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও তৌফিক দিন যেন তার বংশ থেকে তারাও আহমদী হয়ে যান।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)